Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 22 - 27
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

সমীর রক্ষিতের ছোটোগল্পে শিশু শ্রমিক : সমাজের অন্ধকার অধ্যায়

সৈকত মাহাতো
গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
Email ID: saikat.mahato.301@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Samir Rakshit, Short Stories, society, child labour, survive.

Abstract
Every writer has a responsibility towards society. Samir Rakshit is no exception. He has seen our society from various perspectives. In order to collect a treasury of emotions in literature, he delved deep into the heart of society. As a result, he portrayed the struggles of people from different walks of life in his writings. He did not even neglect the everyday struggle of the children behind the veil of civilized society, who are known as child labourers. In his stories, he has included a significant portion of these children's tales of struggle, intending to present them to the readers and society. he has shown how day by day, due to economic instability, talented children are being lost from this society. In order to grasp the current state of affairs in society, they are resorting to labour in their adolescence to sustain their livelihood in unfamiliar territories. financial stability rather than academic success has now become the benchmark of social recognition. girls like 'futi' are constantly fighting to survive, questioning our civilized society every day. So, he has requested everyone to stand by these children, in order to bring back their lost childhood and eradicate child labour.

Discussion

একজন সাহিত্যিক তার সাহিত্যের উপাদান সমাজ থেকে সংগ্রহ করেন। সমাজের নানা দিকগুলি ফুটিয়ে তোলেন সাহিত্যের পাতায়। সাহিত্যিকের চোখ দিয়ে পাঠক নতুন ভাবে চিনতে শেখে সমাজকে। এই রকম একজন সমাজসচেতন সাহিত্যিক হলেন সমীর রক্ষিত। সমাজের নানা খুঁটিনাটি বিষয় জায়গা করে নিয়েছে তাঁর লেখায়। সেই রকম একটি বিষয় হল শ্রমব্যবস্থা, যা সমাজসৃষ্টির আদিকাল থেকে চলে আসছে এবং যার ফল্গুধারা আজও সমাজের উপর দিয়ে সমান ভাবে বয়ে চলেছে। তাইতো গল্পকারের গল্পের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আমরা মেহনতি মানুষজনের কথা জানতে পারি। তবে এই সামাজিক প্রথার গ্রাস থেকে রক্ষা পায়নি কমবয়সি শিশুরাও, পরিণত হয়েছে শিশু শ্রমিকে। শিশু শ্রম নামক একটি সামাজিক ব্যাধি আমাদের সমাজকে দিনের পর দিন পঙ্গু করে দিচ্ছে। শিশুশ্রম আইনকে উপেক্ষা করে আমাদের সমাজের পর্দার আড়ালে এই সকল শিশুদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার মূল কারণ হিসাবে পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতাকেই

তুলে ধরা হয়েছে। তাইতো শহরের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা অট্টালিকার দেওয়ালে কান পাতলে সিমেন্টের প্রলেপের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা ইটগুলি জানতে চায়, তার সেই ছোট্ট শিশু শ্রমিক বন্ধুটির কথা। যার হাতের ছোঁয়ায় সে এমন সুন্দর রূপ পেয়েছে। হোটেলের টেবিল অথবা দোকানের চায়ের কাপগুলি জানতে চায় সেই শিশুশ্রমিকদের কথা, যারা তাদেরকে প্রতিদিন ঘষেমেজে নতুন করে তোলে। আসলে গল্পের মধ্যে দিয়ে পাঠক সমাজের সামনে সেই অলিখিত কাহিনিগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন গল্পকার।

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। এই দিনগুলিতে প্রত্যেকটি পরিবার আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। সারাদিন হৈ হুল্লোড়ের মধ্যেদিয়ে দিন কাটায়। এই রকমই একটি পরিবারে জন্ম ‘খড়্গ’ গল্পের নায়ক বীরুর। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৮ সালে ‘দেশ’ পত্রিকায়। তবে আর পাঁচটা পরিবারের মতো তাদের জীবন অত সহজ ছিল না। মায়ের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনে নেমে এসেছিল অভিশাপের ‘খাঁড়া’। মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও একপ্রকার পরিবারের চাপে বাধ্য হয়েই কর্মজীবনের পথ বেছে নিয়েছিল বীরু। প্রথমদিকে প্রতিবাদ করলে জুটেছিল মায়ের দুহাতের এলোপাথাড়ি ‘কিল, চড়, ঘুষি’। তাইতো বীরু স্বাভাবিক জীবনযাপন ফিরে পাওয়ার আশায় দুর্গামায়ের বিদায়বেলা আশ্বাসবাণী আদায়ের চেষ্টা করেছিল —

“আমি বাঁচবো তো, আমি বাঁচবো তো।”[১]

কিন্তু হায়! ঢাক আর মাইকের উচ্চ আওয়াজের ফলে বীরুর মতো একটি ছোট্ট শিশু করুণ কণ্ঠস্বর মায়ের কান পর্যন্ত পৌঁছায়নি। ফলে এক প্রকার বাধ্য হয়েই অনিশ্চিত জগতের পথে যাত্রা করেছিল বীরু। আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থা বীরুর মতো প্রতিভাসম্পন্ন শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে তার পায়ের নিচে পিষে হত্যা করার চরম খেলায় মেতেছিল। তাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, পড়াশুনা বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। বীরু তবু স্কুলের গণ্ডিতে পা দিয়েছিল, কিন্তু বীরুর থেকে দুবছরের ছোটো তার ভাই পলু অনেক আগেই কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে। মরণ ঘোষের নোংরা চায়ের কাপ ধোয়ার জায়গাটা তার সারাদিনের কর্মস্থল। শিশু শ্রমিকের পাশাপাশি সে পরবর্তীতে একজন দক্ষ চোর হয়ে উঠতে পারে সেদিকটার হাতেখড়ি হয়েছিল মায়ের কৃপায়।

সত্যি ভাবতে অবাক লাগে আমরা কোন্ সমাজ ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। যেখানে মেধার কোনো দাম নেই। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতাই হয়ে উঠছে সামাজিক পরিচিতির মাপকাঠি। যার ফলে সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে বীরুর মতো প্রতিভা।

ঠিক তার দু’বছর পর ‘সহজিয়া’ পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে ‘ঘর থেকে দূরে’ নামক গল্পটি। মূলত বিজয়ার পরের দিন বীরুর বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার আগে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্পর্কে পাঠককে অবগত করতে চেয়েছেন গল্পকার। এক রাতের ব্যবধানে বীরু আজ অনেকটাই পরিণত হয়ে উঠেছে, মাঝে যেন কয়েকটা বছর কেটে গেছে। সে একপ্রকার বাধ্য হয়েছে নতুন জীবনকে বেছে নিতে। তাই তো আজ শত যন্ত্রণা সত্ত্বেও বীরু নীরব। সে কোনো প্রতিবাদ করেনি। নিজের জীবনের এই করুণ পরিণতিকে অযত্নে বেড়ে ওঠা একটি চারাগাছের সঙ্গে তুলনা করেছিল বীরু। তার মনে হয়ে হয়েছিল প্রকৃতির বুকে বেড়ে ওঠা ওই চারাগাছের গোড়ায় কেউ বুঝি খুপরি চালিয়ে দিয়েছে। শত লাঞ্ছনা, ক্ষোভ বুকে নিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা কুলি-কামিনদের মাঝে নিজের বেঁচে থাকার রসদের সন্ধান করেছিল বীরুর। এ শুধু বীরু কাহিনি নয়, বীরুর মতো শতশত শিশু যারা পরিবারের মুখের দিকে তাকিয়ে শৈশবের আঙিনায় দাঁড়িয়ে একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের মতো অভিনয় করে চলেছে তাদের কাহিনি। যারা পরিযায়ী শ্রমিকের শিরোপা মাথায় নিয়ে হাসিমুখে পাড়ি দিচ্ছে মুম্বাই, কেরালা কিংবা তামিলনাড়ুতে।

গল্পকার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকাকালীন ১৯৭৩-৭৪ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পত্রিকা থেকে তার লেখা ‘ছোট্কু’ গল্পটি প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠা দুটি শিশুকে একটি স্থানে মুখোমুখি হাজির করেছেন লেখক এই গল্পে। তবে সেই স্থানে অবস্থানের পিছনে দুজনেরই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। ছয় বছরের রূপ এসেছে বাবা-মায়ের হাত ধরে সমুদ্রের সঙ্গে নিজের পরিচয়পর্ব সারতে, অপরদিকে ছোক্কু এসেছে সংসারে বাবার অনুপস্থিতিতে যে দায়িত্বের শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়েছিল, সেই শূন্যস্থান পূরণের বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে। সামান্য ওইটুকু বয়েস থেকে সে প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছে সমাজের সঙ্গে। বলতে গেলে এক প্রকার হাসিমুখে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে তার এই

করুণ পরিণতিকে। যে বয়েসে রূপের মতো ছেলেরা সবেমাত্র তাদের বাবামায়ের হাতধরে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতে শিখছে, ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তার থেকে কিছু বছরের বড় ছোট্‌কু সেই রাস্তায় অনেক আগেই হাঁটা শুরু করেছে। যে বয়েসে একটি শিশুর দিনের শেষের আশ্রয়স্থল হয় মায়ের আঁচলের তলায়, সেই বয়েসে ছোট্‌কু রাত কাটাচ্ছে কোনো দূরপাল্লার বাসের মধ্যে অথবা বন্ধ হয়ে যাওয়া কোনো দোকানের চালের নিচে। রিক্‌সার প্যাডেলের প্রতিটি পদাঘাতে তার সামনে ভেসে ওঠে পরিবারের সকলের করুণ মুখগুলি, যা তার কাজের গতিকে আরও দ্বিগুণ করতে উৎসাহ জোগায়। জীবনসংগ্রামের রাস্তায় ছোট্‌কু যে অনেক বেশি সক্রিয়, তা কথকের দেওয়া ছোট্‌কুর শারীরিক বর্ণনায় ধরা পড়েছে —

> "বয়েস বড় জোর বার তের কিন্তু উপুর হয়ে পড়ে হাওয়া কাটিয়ে কী কৌশলেই রিক্সা চালাচ্ছে পাকা মানুষের মতো।"[২]

আসলে আমাদের এই বর্তমান সমাজব্যবস্থার কাঠামোর যে ভগ্ন রূপ, সেই ভগ্ন রূপের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের একটি শিশু কীভাবে আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণের সর্বশিক্ষা অভিযানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজের বাস্তবের কঠিন রাস্তায় পথচলা শিখছে এবং একটা সময় পর অন্ধকার জগতের পথ বেছে নিচ্ছে, সেই দিকটি সম্পর্কে পাঠকসমাজকে অবগত করতে চেয়েছেন লেখক। তবে এই গল্পে ছোট্‌কুর এই সংগ্রামকে কুর্নিশ জানানোর পাশাপাশি, সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে, যারা কথায় কথায় শিক্ষায় সমান অধিকারের কথা বলে সেই সকল মানুষকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেছেন। রূপের মধ্যে দিয়ে ছোট্‌কুর এরূপ পরিণতির জন্য শিক্ষিত সমাজকে বিবেকের কাঠগড়ায় তুলেছেন লেখক।

'**অমৃতময় জীবন**' গল্পে সদ্য শৈশব থেকে কৈশরের আঙিনার দিকে ছুটে চলা একটি মেয়ের প্রতিদিনের বেঁচে থাকার লড়ায়ের কাহিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন গল্পকার। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে 'সোনালী বয়স' নামক একটি পত্রিকায়। ক্ষুধা যে কতটা নির্মম রূপ নিতে পারে তার একটি ভয়ংকর সুন্দর চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন গল্পকার তার গল্পে। সামান্য একটুকরো রুটি অথবা একটি ভালো পোশাকের জন্য কীভাবে ফুটপাথে বেড়ে ওঠা ছোট্ট মেয়েটি যৌবনে পদার্পণ করার আগেই শহরে বাবুদের কাছে বিকিয়ে দিচ্ছে তার শরীরটাকে এবং দিনের পর দিন এইভাবে চলতে চলতে একসময় শরীর কেনাবেচার হাটে একজন পাকা দেহ ব্যবসায়ী হয়ে উঠছে, সেই চিত্র তুলে ধরার মধ্য দিয়ে আমাদের আধুনিক সভ্যসমাজের ভীতে কম্পন ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন লেখক। সভ্যসমাজের পর্দার আড়ালে জন্ম নেওয়া এ এক অলিখিত অধ্যায়। দিনের আলো ফুরালে যে অধ্যায়ের রসস্বাদন করার জন্য আমরা আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করি, অথচ দিনের আলোতে এই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটানোর কোনোরকমই সদিচ্ছা প্রকাশ করি না। যে মেয়েরা এই অধ্যায়ের প্রবাহমানধারাকে দিনের পর দিন শত দুঃখ কষ্ট সত্ত্বেও হাসিমুখে বহন করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তারা জানে না ভবিষ্যতে তাদের জন্য কী ভয়ানক পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে। তাইতো লেখক গল্পের নামকরণকেই প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছেন। সত্যিই কী সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের জন্য জীবন অমৃতময়? আর যদি অমৃতময় হয়ে থাকে, তাহলে এর মধ্য দিয়ে জীবনের অমৃতের স্বাদ পাওয়া কী আদৌ সম্ভব? গল্পকার সমাজের এই তথাকথিত অমৃতময় অধ্যায়ের চিত্রগুলি তুলে ধরার মধ্য দিয়ে পাঠকসমাজকে এই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। লেখক গল্পের প্রধান চরিত্রের কোনো নাম উল্লেখ করেরনি। তিনি বারবার মেয়েটি বলে তাকে সম্বোধন করেছেন। কারণ এই অধ্যায়ের সাক্ষী কেবলমাত্র একটি মেয়ে নয়, ওই মেয়েটির মতো হাজার হাজার মেয়ে। যাদেরকে সামান্য ক্ষুধা নিবারণের জন্য অন্ধকার জগতের পথ বেছে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। যারা কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করার আগেই হয়ে উঠছে এক একজন পাকা দেহ ব্যবসায়ী।

১৯৭৩ সালে অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত '**ভাবমূর্তি**' গল্পের সানুর মতোই শত শত সানুকে আজ বেঁচে থাকার জন্য কলকাতার রাস্তাঘাটে, বাসে, ট্রেনে, ট্রামে পরিবারের বোঝা বয়ে নিয়ে ফেরি করতে দেখা যায়। যাদের নিয়ন্ত্রক তিলকের মতো একদল সুবিধাভোগী মানুষের রূপধারী পশুরা। যারা তাদের বিলাসী জীবনযাপনের অর্থ সংগ্রহের মুখ্য উপাদান হিসাবে এই শিশুগুলিকে দিনের পর দিন সমাজের আলোতে অদৃশ্যের মতো শোষণ করে চলেছে। সমগ্র সমাজ সেটি সম্পর্কে অবগত হলেই, নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য জেনেও না জানার ভান করে বসে আছে। এই সকল পশুরা ২৪ ঘণ্টা স্বতন্ত্র

প্রহরীর মতো পাহারা দিচ্ছে শিশুগুলিকে। তাদের কথা না শুনলে অশ্লীল শব্দবাণে বিদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে শিশুমনের মধ্যে জন্ম নেওয়া সামান্যতম শুভ ভাবনাগুলিকে। সানুর মতো শিশুদের এরূপ করুণ পরিণতির জন্য তিলকের পাশাপাশি লেখক দায়ী করেছেন তারক রায়ের মতো সমাজের সুবিধাভোগী মানুষজনকে। যাদের অর্থলালসা এতটাই প্রবল যে, সানুর মতো নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্ম নেওয়া হাজার হাজার সানুকে একপ্রকার বাধ্য করেছে সংসারের বোঝা কাঁধে নিয়ে রাস্তায় নামতে। বাধ্য করেছে কৈশোরের আঙিনায় দাঁড়িয়ে যৌবনের অভিনয় করতে। সানুর মতো যে সমস্ত শিশুকে আমরা আমাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে দেখি, তারা কোনো না কোনো স্বার্থান্বেষী মানুষের দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শোষিত হয়ে, একপ্রকার বাধ্য হয়েই এই রাস্তা বেছে নিয়েছে। গল্পের নায়ক সানু আজ এতটাই পরিণত হয়ে উঠেছে যে, নিজেকে অন্যের কাছে বিক্রি করে পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর শেষ চেষ্টাটুকু করতে পিছুপা হয়নি। কিন্তু সফল হয়নি তার এই প্রচেষ্টা। একবুক হতাশা নিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য করা হয়েছে পুঁজিবাদীদের বিনোদনের উপাদান জোগান দেওয়ার কাজে।

কলকাতার অলিতে গলিতে গজিয়ে ওঠা হোটেল, রেস্তোরা, চায়ের দোকানের অন্ধকার কোণটিতে যে সকল শৈশবগুলি প্রতিনিয়ত দুমুঠো অন্নের জন্য সংগ্রাম করে চলেছে, তাদের প্রতি কুর্নিশ জানিয়ে, সেই সকল জীবনযোদ্ধাদের কাহিনিই গল্পকার ফুটিয়ে তুলেছেন 'পাঞ্জা' নামক গল্পটিতে। ১৯৭৩ সালে কস্তুরি পত্রিকায় গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পের প্রধান চরিত্র পাঞ্জার দিনযাপনের চিত্রর মধ্যদিয়ে ওই সকল শিশুদের জীবনসংগ্রামের অলিখিত ইতিহাস সম্পর্কে পাঠকসমাজকে অবগত করতে চেয়েছেন লেখক। দিনের পর দিন ওই শিশুদের উপর কীভাবে অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে কথক পাঞ্জার সম্পর্কে বলেছেন —

> "পাঞ্জা সাত বছর বয়েস থেকে কলকাতার বিভিন্ন হোটেলে, রেস্টুরেন্টে, চায়ের দোকানে নিজেকে ভাড়া খাটাচ্ছে।"[৩]

পাঞ্জার মতো শতশত শিশু, যারা দিনের পর দিন অত্যাচারিত হতে হতে পরিণত হচ্ছে যন্ত্রে। হারাতে বসেছে তাদের ফেলে আসা শৈশবকে। এমনকি কাজের পর উপযুক্ত পারিশ্রমিকও তাদেরকে দেওয়া হয় না। কথক পাঞ্জার উপর ঘটা শারীরিক অত্যাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন —

> "মাথাটা চরকির মতো ঘুরে গেল পাঞ্জার। কিন্তু তার মুখ থেকে কোন শব্দ বেরল না। অথচ সে বোবা নয়।"[৪]

আসলে এই প্রসঙ্গগুলি তুলে এনে সমাজের নগ্ন কঙ্কালসার রূপটি পাঠকদের কাছে উন্মোচন করতে চেয়েছেন লেখক। ধিক্কার জানিয়েছেন, সমাজে যারা নিজেদেরকে মানবতাবাদী, বাস্তবাদী বলে জাহির করে, তাদের এই অসহায় শিশুদের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণের। তিনি এই ভেকধারী মানুষগুলোর ভরসায় থেমে থাকেননি। পাঞ্জাকে নিজের মতো করে গড়ে তুলে নিতে চেয়েছিলেন। স্বপ দেখেছিলেন। যে স্বপ্ন বাঁচার রসদ জোগায়, শেখায় নতুন করে পথ চলতে, অধিকার বুঝে নিতে। তাইতো পাঞ্জা স্বপ্ন দেখেছিল তার হাতের পাঞ্জাও একদিন বড় হবে। তখন সে তার সঙ্গে ঘটা সমস্ত অন্যায়ের হিসাব বুঝে নেবে। এ যেন শুধুমাত্র পাঞ্জার কথা নয়। পাঞ্জার মতো শতশত শিশু, যারা দিনের পর দিন মুখ বুজে সমস্ত অপমান, অত্যাচার সহ্য করে আসছে পালাবদলের আশায়, তাদের কথা।

১৯৮৩ সালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত '**হানিমুন**' গল্পে আলিবাবার ছেলের মতোই হয়তো সবেমাত্র জীবনযুদ্ধের পাঠ নিতে শুরু করেছে দার্জিলিঙের ম্যালের পাশে ঘোড়া হাতে দাঁড়িয়ে থাকা ফুটফুটে কচি ছেলেটি। তাইতো সে বিজনের মতো এলিট শ্রেণির লোককে বিনোদন উপহার দেওয়ার প্রচেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। সমগ্র গল্পের সামান্য অংশে চিত্রটি ধরা পড়েছে। গল্পের বিষয়বস্তু অন্য হলেও, এই চিত্রটির মধ্যদিয়ে বিভিন্ন ভ্রমণস্থানে ঘুরে বেড়ানো সংগ্রামী শিশুদের কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখক। যা সর্বক্ষেত্রে শিশুশ্রমিকদের উপস্থিতির জানান দেয়। পাশাপাশি আমাদের চারপাশে যে সমস্ত ভ্রমণ স্থানগুলি আছে, সেখানে যে একদল শিশু বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে, সে সম্পর্কে পাঠকসমাজকে অবগত করতে চেয়েছেন গল্পকার। যার ব্যাপ্তি কোনো গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র দেশের আনাচে কানাচে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র লক্ষ করা যায়। গল্পকার শিশুশ্রমিক নামক সামাজিক ব্যাধি থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন কেবলমাত্র শিক্ষিত সমাজ এগিয়ে এলেই সম্ভব।

নগর কলকাতার বুকে যে ঝুপড়িগুলো দেখা যায়, সেই রকমই একটি ঝুপড়িতে বেড়ে উঠেছে 'ফুটের ফুতি' নামক গল্পের নায়িকা ফুতি। গল্পটি শারদ গল্পগুচ্ছ পত্রিকায় ২০০৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ছোট্কুর মতোই ফুতিকে পরিবারের কথা ভেবেই এই পথটা বেছে নিতে হয়েছিল। তবে ফুতির পিছনের ইতিহাসটা কিন্তু ছোট্কুর মতো নয়, ছোটকুর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বাবাবেঁচে থাকা সত্ত্বেও, বাবার সংসারের প্রতি দায়সারা মনোভাবের জন্যই একপ্রকার বাধ্য হয়েই এই রাস্তা বেঁচে নিতে হয়েছিল ফুতিকে। তবে শুধু ফুতি নয়, ফুতির মতো রানি,কেয়া, শ্যামলীরাও বেছে নিয়েছিল এই রাস্তা। আসলে গল্পকার তার অনেকটা সময় কাটিয়েছেন এই নগরীর বুকে। অনেক কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন ফুতির মতো চরিত্রগুলিকে, যারা বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটা মুহূর্তে সংগ্রাম করে চলেছে। তারই প্রতিফলন ঘটেছে গল্পে। যে বয়েসে একটি শিশুর গন্তব্যস্থল হওয়া উচিত বিদ্যালয়, ঠিক সেই বয়েসে দাঁড়িয়ে ফুতির মতো মেয়েরা দিন শুরু করছে শহরের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়িয়ে। ছেঁড়া বস্তা হাতে নিয়ে। এই বস্তা যেন তাদের আলিবাবার গুহা। যার মধ্যে থাকে তাদের বেঁচে থাকার গোপন রসদ। সেখানে উঁকি মারার অধিকার শুধু তাদেরই আছে। আসলে শুধু ফুতি নয়, শহরের বস্তিতে যে মানুষজন বসবাস করে, তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটা মুহূর্তে যে সংগ্রাম করতে হয়, তারই একটি বাস্তব চিত্র পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখক। যে সংগ্রামে কেবলমাত্র বাড়ির বড়রা শুধু নয়, ছোটরাও সামিল হয়। কাগজ কুড়িয়ে ফুতির ঝুপড়িতে ফেরার পরেই তা ধরা দিয়েছে গল্পকারের কলম —

> "ফুতি বস্তা ঢালা মাত্র সন্ধ্যা যেন জোর করে ওঠে। হাত বাড়ায়। ছুটে আসে মনা মতি। তারাও হাত লাগায়। প্লাস্টিক, কাগজ, কাঁচ সব আলাদা আলাদা করে সাজায়।"[৫]

যে বয়েসে একটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য পুষ্টিকর খাদ্য ও উপযুক্ত শিক্ষা দরকার, সেই বয়েসে ফুতির সারাটা দিক কাটে কলকাতার অলিতেগলিতে কর্পোরেশনের কলের জল খেয়ে। তবে তা কিন্তু কোনভাবেই তার বেড়ে ওঠার পথে বাঁধা সৃষ্টি করতে পারেনি। মায়ের সঙ্গে ঘটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল সে, ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাবার উপর। শিক্ষিত সমাজ তাকে এবং তার সঙ্গীদের চোর বলায় মনে মনে গর্জে উঠেছিল ফুতি। পেতে চেয়েছিল তাদের কাজের যোগ্য সম্মান। জীবনের এই বেড়াজাল থেকে নিজেকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখলেও, সে ভালো ভাবেই জানতো ঝুপড়িবাসীদের এই জীবন থেকে মুক্তি কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। সে গেলে তার মতো হাজারটা ফুতি জন্ম নেবে এই ঝুপড়িতে। আর যাদের দিন শুরু হবে সেই পুরাতন রীতি মেনেই। তাইতো চোর পুলিশ খেলার সময় সে সব সময় চোর সাজতো। খেলার ছলে চোর সেজে লুকিয়ে বেড়াতো, সে ওই লুকানোর মধ্য দিয়ে ক্ষণিকের জন্য ওই জগৎ থকে পালিয়ে বাঁচার স্বাদ নেওয়ার চেষ্টা করত।

আমাদের এই সমাজ সত্যিই খুবই বিচিত্র এক সমাজব্যবস্থা। যে সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত বাবা যখন তার সন্তানের আবদার মেটানোর জন্য অসময়ের সবজির সন্ধান করছেন, ঠিক একই সময়ে দাঁড়িয়ে একটি শিশুকে তার বাবার অকাল মৃত্যুতে পড়াশুনার পাঠ চুকিয়ে, বেঁচে থাকার পাঠ নেওয়ার মাঠে নামালেন গল্পকার 'আলিবাবা' গল্পে। গল্পটি প্রথম ছাপা হয় ২০০৪ সালে শারদীয়া 'পুরশ্রী' পত্রিকায়। আসলে গল্পের নামকরণের মধ্যদিয়ে তিনি সমাজের একটি ভিন্ন দিক তুলে ধরতে চেয়েছেন পাঠক সমাজের সামনে। আলিবাবার প্রসঙ্গ টেনে এনে সমাজের দিনের আলোতে লুকিয়ে থাকা দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আরব্য রজনীর আলিবাবার গুহা যেমন ধনসম্পদে পরিপূর্ণ, ঠিক এই আলিবাবা যেন সমাজের নানা সামাজিক দিকের পসার সাজিয়ে বসেছেন। লেখক কথককে শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি করে তার সামনে এমন একটি সমাজকে তুলে আনার চেষ্টা করেছেন, যে সমাজকে আমরা তথা শিক্ষিত সমাজ উপেক্ষা করে চলার পক্ষপাতী। তিনি এই ধারণার পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন কথকের মধ্য দিয়ে। প্রতিটি মানুষের সমাজের প্রতি যে দায়বদ্ধতা থাকে, সেই দায়বদ্ধতার কথা মনে করাতে চেয়েছেন লেখক। দিনের পর দিন আলিবাবার ছেলের মতো কত ছেলে শুধুমাত্র আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে শিশুশ্রমিকে পরিণত হচ্ছে, সেই দিকটি তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি এদের আগামীর পথচলা যাতে অন্যরকম হয়, তারা যেন শিক্ষাগ্রহণ করে মানুষের মতো মানুষ হতে পারে। সমাজ তাদেরকে শ্রমিক রূপে নয়, একজন ভালো মানুষ হিসাবে চিনবে, সেই যাত্রাপথের সঙ্গী হওয়ার জন্য লেখক সকলকে এগিয়ে আসতে বলেছেন।

Reference:

১. রক্ষিত, সমীর, 'গল্পসমগ্র-১', দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ২০১৩, পৃ. ১৪

২. রক্ষিত, সমীর, 'গল্পসমগ্র-২', দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৫, পৃ. ৩৫

৩. তদেব, পৃ. ৬৪

৪. তদেব, পৃ. ৬৪

৫. রক্ষিত, সমীর, 'গল্পসমগ্র-৪', দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ১৯৫